চার-ইয়ারি কথা : এক চিরায়ত কথা

মলয়েন্দু দিন্দা

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার হিসেবেই সুপরিচিত। তবে শুধু প্রবন্ধেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবন্ধর পাশাপাশি তিনি কবিতা, বিশেষ করে সনেট আর ছোটগল্পও লিখেছেন অনেক। অথচ কবি বা গল্পকার প্রমথ চৌধুরীর কথা আমরা স্মরণে রাখি না। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে : প্রমথ চৌধুরী নিজেই জানিয়েছেন যে সাবালক হবার পূর্বেই তাঁর মনে সাহিত্যিক হবার সাধ জন্মে। কৈশোর থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন গল্পকার হবার। লেখক জীবন শুরুও করেছিলেন গল্প লেখা দিয়ে—অবশ্য মৌলিক গল্প নয়, অনুবাদ গল্প। কিন্তু সাহিত্যিক হবার সাধে অপ্রত্যাশিত বাধা পড়ল। প্রথম গল্প তিনি নিজে না লিখে ফরাসি থেকে একটি গল্প (Prosper Merimée-র 'Etruscan Vase') অনুবাদ করেন ও সেটি *সাহিত্য* পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৯৮) 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। সে অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নি। তাঁর অনভিমত রবীন্দ্রনাথ *সাধনা*-য় (অগ্রহায়ণ ১২৯৮) প্রকাশ করেন এই বলে যে :

> ...প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাঙ্গলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়—ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মুল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষামাধুর্য্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ হেন আক্রমণ প্রমথ চৌধুরীর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তারপর তিনি 'কার্মেন' অনুবাদে হাত লাগান কিন্তু শেষ করতে পারেন নি বলে প্রকাশও করেন নি। এর ফল হলো এই যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, "আমার গল্প লেখার মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হতে না হতেই বিলীন হয়ে গেল, ভাষার দারিদ্র্যবশত" (*বিয়োগপঞ্জি*, পৃ. ৫২)।

এর সঙ্গে আরও যোগ করলেন :

> এ অবস্থায় গল্প লেখার ইচ্ছা ত্যাগ করলুম, কিন্তু গল্প রচনার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে রয়েই গেল, ফলে মনে মনে গল্প রচনা করতে আমি বিরত ছিলুম না। তখন আমি সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় ছিলুম। সুতরাং মনে মনে খেয়াল দেখবার আমার কোনো বাধা ছিল না, অবসরের ত নয়ই। (*ঐ*, পৃ. ৫২)

যৌবনের এই সময়েই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের। দুদিনের আলাপেই প্রমথ চৌধুরী বুঝতে পারলেন যে তাঁর মনগড়া কথা শোনবার একজন উপযুক্ত শ্রোতা হলেন নাটোরের মহারাজ। সে সময় তাঁরা উভয়েই বেশির ভাগ সময় গল্প করে কাটাতেন —আর সেই বাজে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তিনি দু-চারটি স্বরচিত গল্পও জুড়ে দিতেন। মহারাজ নাটোর সেইসব গল্পের তারিফ করতেন। সেই ভরসাতেই এরকম দু-একটি গল্প তিনি পরে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'চার-ইয়ারি কথা' হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি। এবং এটিই হচ্ছে তাঁর

প্রথম মৌলিক গল্প। মহারাজ নাটোরের অকপট সহানুভূতি ও সখ্য না লাভ করলে তিনি হয়ত পরবর্তী কালে আর গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হতেন না।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প লেখার পেছনে মহারাজ নাটোর ছাড়া আরও একজনের নিঃসংশয়াতীত অবদান ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথ। যে রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক আক্রমণের জন্য তিনি একদিন গল্প লেখা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন, পরে তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় আবার গল্প লেখায় হাত দেন প্রমথ চৌধুরী। এই পরিবর্তন ঘটে *সবুজ পত্র* প্রকাশের পরেই—অর্থাৎ *সবুজ পত্র*-র প্রথম যুগে, যে যুগকে রবীন্দ্রনাথ 'সম্পাদক ও একটি লেখকের লগি ঠেলার যুগ' বলেছেন। *সবুজ পত্র*-র পাতা ভরাট করতে প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও বেনামে মূলত প্রবন্ধই লিখতেন। এসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন শুধু প্রবন্ধ লিখে লিখে তাঁর [প্রমথর] লেখার হাত নষ্ট হচ্ছে। তাই মাঝে মধ্যে লেখার হাত বদল করে নিলে ভাল হয়। অর্থাৎ প্রবন্ধ লেখার ফাঁকে ফাঁকে গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখার চেষ্টা করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের এ উপদেশ দেবার একটি বাস্তব তাগিদও ছিল। প্রথম যুগে *সবুজ পত্র*-র লেখক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। *সবুজ পত্র*-র লেখক বলতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও সম্পাদক নিজে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> সবুজ পত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লোকে বলবে কি? এক ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকবে—তারপরে হয় ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে।

সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রমথকে বলেন, "তুমি একবার এ লাইনে [ছোটগল্প লেখা] চেষ্টা করে দেখ। যদি হাত খুলে যায় তাহলে কিছুদিন চলবে বেশ।" তারপরেই আর-একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন যে মণিলাল [গঙ্গোপাধ্যায়] তাঁকে *সবুজ পত্র*-র প্রতি সংখ্যায় একটা করে গল্প লেখার জন্য নিত্য তাগাদা দিচ্ছেন। বিব্রত রবীন্দ্রনাথ প্রমথকে বলেন, "তুমি এই ছুটিতে একটা গল্প লেখার চেষ্টা করো—কেবলি এক হাতের গল্প হওয়া ভাল নয়।" রবীন্দ্রনাথ যে ঐকান্তিকভাবে চাইছিলেন প্রমথ গল্প লেখায় হাত দিক—তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর-একটি চিঠিতে। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুশি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে—অবশ্য সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটা জিনিস হবে—অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্তি হবে—ঝকঝক করবে অথচ কঠিন হবে—কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিষ।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমাগত তাগাদায় ও উৎসাহে প্রমথ চৌধুরী গল্প লেখায় হাত দেন—যার ফলে আমরা পেলাম এক অনবদ্য গল্প—'চার-ইয়ারি কথা'। গল্পটি তিনি ১৩২২-এর ফাল্গুন মাসের মধ্যেই শেষ করেন। লোকমুখে খবর পেয়ে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> তোমার গল্পটি মেজে ঘষে বাগিয়ে রেখে দিয়ো। তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না—এখন থেকে তোমার এই এক বহু হবার পথে চলল।

প্রথম গল্প লেখার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও শুভানুধ্যায়ীদের মতামত শোনার জন্য প্রমথ চৌধুরী গল্পটি সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাতে আপত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর মতে গল্পটি আচমকা বের করতে পারলেই ভালো হতো। রবীন্দ্রনাথ আরও চেয়েছিলেন যে *সবুজ পত্র*-র চৈত্র সংখ্যায় (১৩২২) 'চার-ইয়ারি কথা'-র পুরোটাই প্রকাশ করা হোক। তা না করে প্রমথ চৌধুরী গল্পটি বের

করেন তিন কিস্তিতে (চৈত্র ১৩২২, বৈশাখ ১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)। *সবুজ পত্র*-য় প্রকাশিত হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত খসড়াটি পুরোটাই পড়েছিলেন। তাই প্রথম পর্ব *সবুজ পত্র*-য় প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন :

> ...এখন মনে হচ্ছে তোমার গল্পগুলো উল্টোদিক দিয়ে সুরু হলে ভাল হতো। তোমার শেষ গল্পটা [আমার কথা] সবচেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টানত—তারপর অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত।

॥ ২॥

সবুজ পত্র-য় 'চার-ইয়ারি কথা' বেরবার পরই অনেকে গল্পটির সুখ্যাতি করেন। তখন লেখক নিজেই গল্পটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ১৯১৬-য় এবং ৯৭ পৃষ্ঠার এই ছোট বইটি উৎসর্গ করেন পত্নী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে। প্রথম প্রকাশের পরই বইটি অনেকের কাছে ক্লাসিক বলে গণ্য হয়। গল্পটি *প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী*-র [বসুমতী সংস্করণ] অন্তর্ভূত হয় ১৯৩০-এ; প্রমথ চৌধুরীর *গল্পসংগ্রহ*-এ [বিশ্বভারতী সংস্করণ] গৃহীত হয় ১৯৪১-এ। আলাদা করে বিশ্বভারতী গল্পের বইটি প্রকাশ করে ১৯৫৩-য়। এটির পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৬৮ ও ১৯৯৫-এ। গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ, প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে। ইংরেজি তর্জমাটি করেন ইন্দিরা দেবী। 'চার-ইয়ারি কথা'-র প্রতি লেখকের ও তাঁর সহধর্মিনীর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল—তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি চৌধুরী দম্পতি বইটি বিদেশ থেকে, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর আমেরিকান পত্নী লীলা রায় (প্রকৃত নাম Alice Virginia Orndorf)-এর সাহায্য চান। বিয়ের পরেই গুরুজনদের তলব পেয়ে লীলাদেবী যখন আমেরিকা যান তখন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ইংরেজি তর্জমাটি। বইখানা, অন্নদাশঙ্করের মতে, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক। কিন্তু একই জিনিস যে ইংরেজ-মার্কিনদের মন পাবে এমন কোনো কথা নেই। ওরা কেউ ছাপতে রাজি হয় না। অন্নদাশঙ্কর সে কথা লিখে প্রমথ চৌধুরীকে জানান এবং বলেন যে অনুবাদটি সেকালের ইংরেজি; তাকে একালের ইংরেজি করতে হলে আর কাউকে দিয়ে মাজাঘষা করা দরকার। তিনি নাম করেন তাঁর বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্য-র, যাঁকে প্রমথ চৌধুরী নিজেও চিনতেন। এ কথায় প্রমথ চৌধুরী রাজি হন না; তাঁর ধারণা, ইন্দিরা দেবীর ইংরেজিতে কেউ হাত দিতে পারে না। ফলে তর্জমাটি অন্য কাউকে দিয়ে মাজাঘষা না করেই ফেলে রাখা হয়। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ১৯৪৪-এ পুলিনবিহারী সেন-এর উদ্যোগে বিশ্বভারতী থেকে বেরোয় 'চার-ইয়ারি কথা'-র ইংরেজি তর্জমা, *Tales of Four Friends* নামে। এটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই *Times Literary Supplement* (June 1944)-এ বইটির একটি সমালোচনা বেরোয়, যাতে বলা হয় :

> *Tales of Four Friends* is an Indian attempt to write the counterpart of such tales as Mr. Kipling's *Without Benefit of clergy* and Pierre Loti's Romantic accounts of exotic armours. We need only add that Mr. Chaudhuri's style is worthy of the high reputation his magazine has won as a record of all that is best in contemporary Bengali literature.

বিলেত থেকে ফিরে আসার (১৮৯৬) বছর দশেক পরে (১৯১৬) 'চার-ইয়ারি কথা' লেখেন প্রমথ চৌধুরী। গল্পের বইটি পড়ে সেসময় অনেকের চটক লাগে—বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের। সমালোচকদের কাছেও গল্পটি 'নতুন' বলে বিবেচিত হয়। দু-চার জন সমালোচক অবশ্য বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এই বলে যে গল্পগুলি ফরাসি থেকে ধার করা; কেউবা বলেন ওগুলি আনাতোল ফ্রান্স-এর গল্প থেকে চুরি করা। প্রমথ চৌধুরী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন যে, যাঁরা ফরাসির কথা বলছেন তাঁরা ফরাসি ভাষা ও ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; আনাতোল ফ্রান্সের কথা যাঁরা বলছেন, আনাতোল ফ্রান্সের গল্পের সঙ্গে যদি তাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় থাকতো, তাহলে তাঁরা গল্প লেখককে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতেন না। প্রমথ চৌধুরীর মতে গল্পটির পুরোটাই তাঁর স্বকপোলকল্পিত। এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর একটি পূর্বস্মৃতিতে; এটি অনেকেরই অজানা। তাই এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি :

> ...আমি একদিন রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় মহারাজ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম 'হঠাৎ এত রাত্তিরে আগমনের কারণ কি?' তিনি উত্তর করলেন 'চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটেছে তাই শুতে যেতে ইচ্ছে করছে না, চল দুজনে বেড়িয়ে আসি'। 'কোথায় বেড়াতে যাওয়া যাবে?' উত্তর এল, 'পথে পথে, তারপর গড়ের মাঠে, যেখানে অবাধ জ্যোৎস্নার ভিতর ঘুরে বেড়াতে পারব।' আমি উত্তর করলুম, 'আপনার দেখছি জ্যোৎস্নার নেশা ধরেছে।' তিনি বললেন—'ধরবে না? দেখছ না চাঁদের আলো শ্যাম্পেনের ফেনার মত চাঁদের পেয়ালা থেকে আকাশময় ঝরে পড়ছে।' এই উপমা শুনে আমি হেসে উঠলুম ও বল্লুম, 'চলুন যাই, বিনে পয়সায় প্রাণভরে প্রকৃতির শ্যাম্পেন পান করে আসা যাক্।'
>
> এই কথোপকথনের পর আমি, মহারাজ ও তাঁর গোপাল নামক আমাদের সমবয়সী একটি আমলা—আমরা তিনজনে পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেরালুম।...যেতে যেতে শেষটা লালরাস্তায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন একটা বেজে গিয়েছে, সে রাত্তিরে সত্যই অপূর্ব জ্যোৎস্না ফুটেছিল। সে জ্যোৎস্নার বর্ণনা আমি 'চার ইয়ারী কথা'র প্রথম কথায় লিপিবদ্ধ করেছি। হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল এল। সে খেয়ালটি আমি গল্পচ্ছলে আমার সঙ্গী দুটিকে শোনালুম। তাঁরা নীরবে আদ্যোপান্ত গল্পটি শুনে গেলেন, আর দুজনেরই বিশ্বাস হল যে আমি যে ঘটনার কথা বলছি সেটি একটি সত্য ঘটনা। গল্পটি যখন শেষ হল তখন গীর্জের ঘণ্টায় দুটো বাজলো, আমরাও বাড়ীমুখে ফিরলুম।
>
> সে গল্পটি হচ্ছে—'চার ইয়ারী কথা'র প্রথম গল্প।

এই স্মৃতিলিপি থেকে বলা যায় যে গল্পটি আগাগোড়া তাঁর নিজের রচনা—কোনো বিদেশি গল্পের ছায়া বা ভাব অবলম্বনে রচিত নয়। বরং সেসময় অনেকেই প্রমথ চৌধুরীকে মুখে বলেছেন : তাঁর নায়িকাগুলির বর্ণনা, কথোপকথন ও চরিত্রাঙ্কন এত নিখুঁত যে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে 'চার ইয়ারি কথা'-র চারটি নায়িকার সঙ্গে বিলেতে তাঁর নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন লেখা সম্ভব নয়। প্রত্যুত্তরে প্রমথ চৌধুরী বলেন : "প্রথম নায়িকা হচ্ছে পাগল, দ্বিতীয়টি চোর, তৃতীয়টি জুয়াচ্চোর, আর চতুর্থটি ভূত। বলা বাহুল্য, একরকম চারটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের নায়িকার একটির পর একটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। এই

চারটিই আমার মনগড়া। তবে এর ভিতর তৃতীয় গল্পের নায়িকার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, যাকে আমি রিণী নামে গড়ে তুলেছি।''

সেকালে পাঠক সমাজের বিশেষ উৎসাহ ছিল তৃতীয় গল্পের রহস্যময়ী নায়িকা রিণীকে নিয়ে। বিশেষত রিণীর সঙ্গে লেখকের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তা-ই নিয়ে। *আত্ম-কথা*-য় এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী যা লিখেছিলেন তার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। আর যে-কিছুটা অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা *বৈশাখী*-তে (১৩৫২) প্রকাশিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকরা ঐ লেখাটি অনুগ্রহ করে পড়লে *চার-ইয়ারি কথা*-র রহস্যময়ী নায়িকা রিণীর আসল নাম ও পরিচয় জানতে পারবেন। এখানে খুব সংক্ষেপে রিণীর পরিচয় তুলে ধরা হলো। প্রমথ চৌধুরীর জবানিতেই শুনুন :

> ...আমি এমন একটি যুবতীকে জানতুম, যাকে রিণীর রূপ দেওয়া যায়। তার যথার্থ নাম ছিল কাতি,—ইংরেজী Katieর ফরাসী উচ্চারণ। সে আধা-ফরাসী আধা-ইংরেজ। ...সে অল্পবয়সে ব্রাসেল্‌সে থাকত, সেখানকার Conservatoire-এ, ভাল করে গানবাজনা শেখবার জন্যে।...সে ছিল অভিজাতবংশীয়া।...কাতি ছিল অতিশয় সুন্দরী এবং অতিশয় চালাক-চতুর। কাতির মুখ ছিল লম্বা ধরণের, নাক লম্বা, চোখও লম্বার দিকে বড়; এবং সমস্ত মুখচোখে একটা তীক্ষ্ণভাব ছিল...
>
> আমি এই একটি সত্যিকারের মেয়েকে ভেঙ্গে ''চার ইয়ারি কথার'' চারটি নায়িকাকে তৈরী করেছি।...দ্বিতীয় গল্পের নায়িকাকে আমি বইয়ের দোকানে প্রথম দেখি, কাতিকেও তাই। তারপর যা সব লিখেছি, সে সব হচ্ছে সীতেশকে ফোটাবার জন্যে।
>
> যখন ''চার ইয়ারি কথা'' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাকে বহুলোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, এ গল্পটি real কিনা। উত্তরে আমি বলি, তাহলে গল্পটি উত্‌রেছে। কেননা, যা আগাগোড়া কল্পনার জিনিস, অনেক পাঠকের কাছে তা সত্য বলে মনে হয়েছে। কাতির সঙ্গে আমি ভালবাসায় পড়ি আর না পড়ি, সেকালে যুবক পাঠকের দল অনেকে রিণীর প্রেমে পড়েছিল।...

বাস্তবে রিণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সে প্রশ্নের কোনো সোজাসাপটা উত্তর না দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেন :

> ...বিলেতে গিয়ে, আর সেখানে ৩। ৪ বৎসর আমি যে কোনো সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখি নি এবং তাদের সংশ্রবে আসি নি, এ কথা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না। বিশেষত আমি যখন বিলিতি নায়িকার বিষয় গল্প লিখেছি, আর তার একটি গল্পে সত্য ঘটনার ছাপ আছে। গল্পলেখককে তার কল্পিত নায়িকার নায়ক বলে ভুল করা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সহজ। এ হচ্ছে সাহিত্যিকদের কপালের লেখা। আমি একজন সাহিত্যিক, এবং এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে গণ্য ও মান্য সাহিত্যিক। কি করে আমি সাহিত্যিক হলুম, সে-কথা পরে বলব। মোট কথা হচ্ছে এই যে, বিলেত থেকে মেম ঘাড়ে করে দেশে ফিরি নি।...

ঠিক কথা। প্রমথ চৌধুরী বিলেত থেকে মেম ঘাড়ে করে নিয়ে আসেন নি। তবে কাতি-র সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তার একটি মাত্র প্রমাণ আছে। কাতি-র আসল নাম ছিল কেটি কার্পেন্টার। ইন্দিরা দেবীর একটি চিঠির উত্তরে ১৮৯৬-এর অক্টোবর মাসে ভাগলপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী লেখেন :

> কেটি কারপেন্টার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কি ছিল সে ভালবাসা না fascination,

ভণ্ডামি না আত্মপ্রেরণা সে কথা আর এখন বিশ্লেষণের দ্বারা পরিষ্কার রকম বুঝে নেবার কি দরকার! মড়া কেটে দেখা জিনিষটের ওপর আমার প্রবৃত্তি নেই। তবে সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলতে পারি, ব্যাপারটা খেয়ালের ওপর আরম্ভ হয়েছিল সময় কাটাবার জন্য, ইংরেজিতে যাকে বলে pastime—ক্রমে খেলাটা জুয়াখেলায় পরিণত হয়েছিল। আর বেশি বলবার দরকার নেই—ও জুয়োখেলা শব্দটাতেই কি সমস্ত বোঝা যাচ্ছে না। তবে মানবহৃদয় নিয়ে খেলা আমরা কেউই সহজে খেলতে পারি নে।

॥ ৪ ॥

চার-ইয়ারি কথা বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দিকচিহ্ন। বিশেষ করে ন্যারেটলজি চর্চার ক্ষেত্রে। **ফর্ম** বা আঙ্গিকের বিচারে এটি 'একের-ভেতর-দুই' বা 'গল্পর-ভেতর গল্প'-র একটি বিশেষ রূপ। গল্পের গোড়ায় আছে একটি 'কাঠামো গল্প' বা 'ফ্রেম গল্প', আর তার ভেতরে আছে 'মূল গল্প'। আবার ভেতরের গল্পের মধ্যে আছে চার-চারটি আলাদা আলাদা কাহিনী। অবশ্য এই আলাদা চারটি কাহিনীর মধ্যে একটি ভাবগত যোগ অবশ্যই আছে। গল্পের শেষে আবার ফিরে আসে কাঠামো গল্পটি। ফ্রেম গল্পে আছে মোট চারটি চরিত্র—সেন, সীতেশ, সোমনাথ ও ফ্রেম গল্পর কথক/লেখক (রায়) নিজে। কাঠামো গল্পটি আমি/আমরা-র বয়ানে লেখা। কাঠামো গল্পটি এসেছে মূল গল্পটির প্রেক্ষিত রচনার জন্য। কাঠামো গল্পে দেখা যায়, ক্লাবের সান্ধ্য আসরে তাস খেলতে এসে চার বন্ধু বাড়ি ফেরার মুখে আটকে পড়ে আকাশের বেগতিক অবস্থার জন্য। আলো-

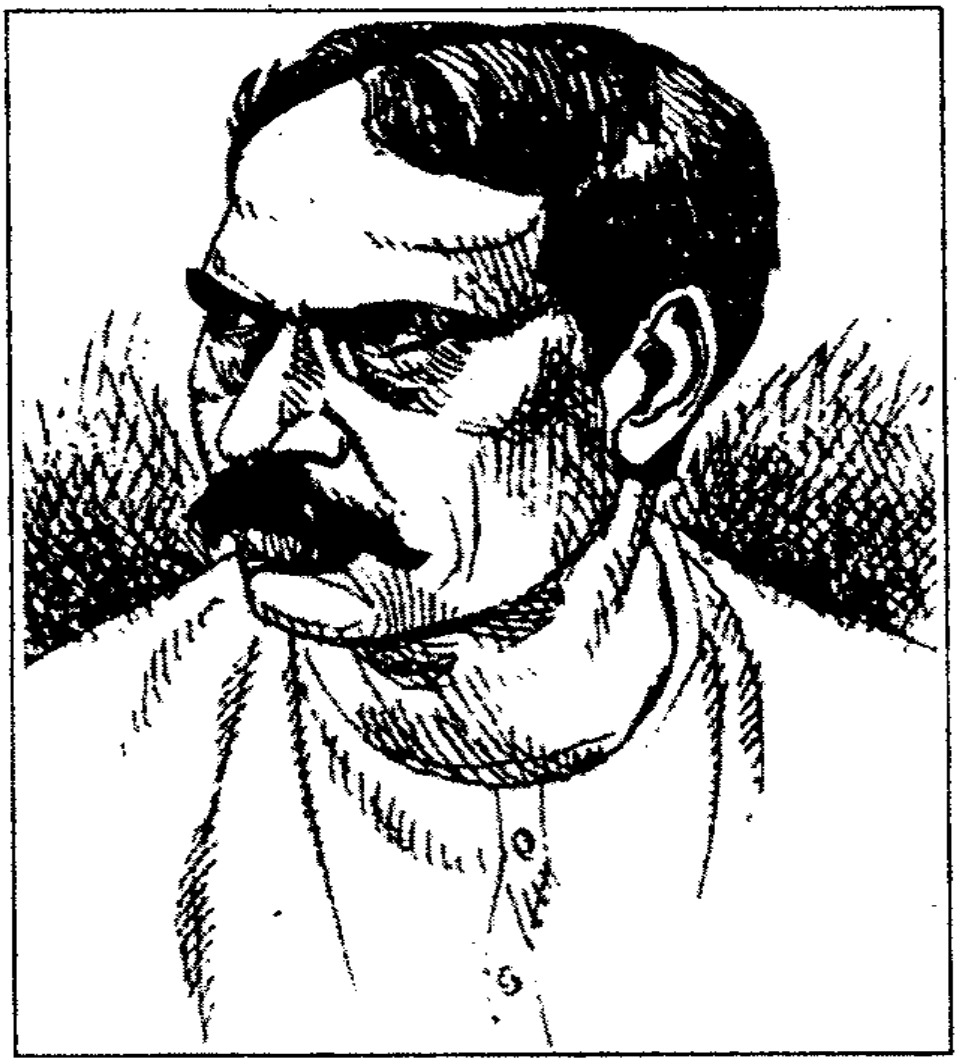

প্রমথ চৌধুরী *শিল্পী : অনুপ রায়*

আঁধারিতে ভরা ও আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় শঙ্কিত রাতে চার ইয়ারির মনে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। আকাশ-জোড়া মলিন ও মরা আলো তাদের স্তম্ভিত করে দেয়। সেই রাতের সেই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর যে অপরূপ সৌন্দর্য ছিল তার দিকে চেয়ে সকলেই এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে চার ইয়ারিরা একে একে তাঁদের মনের মধ্যে জমে থাকা গুপ্ত সুপ্ত প্রণয় কাহিনী বলতে শুরু করেন। এই অংশে প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন : যেন ঐ রাতের চাঁদের 'দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো' তাঁদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁদের অন্তরের গোপন কথা যেন টেনে বের করে আনছে। ফলে, চার বন্ধু তাঁদের গোপন প্রণয় কাহিনী বলতে শুরু করেন। এখান থেকে শুরু হয় মূল গল্প।

মূল গল্পর ভেতরে প্রথমে আসে সেন-এর কথা। ফ্রেম গল্পে বর্ণিত দুষ্ট ক্লিষ্ট আলোর বিপরীতে এখানে পাওয়া যায় অপূর্ব এক পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্নার বর্ণনা—যার আলোর মায়াতে 'পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠেছিল, যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল'। তখন সদ্য M.A. পাশ করা যুবক সেন; সংসারে তাঁর কোনো দায়-দায়িত্ব ছিল না, কোনো নারীর প্রতি প্রণয়াসক্তিও ছিল না। তবু তাঁর মনে ছিল না কোনো সুখ, ছিল না সোয়াস্তি—ছিল শুধু এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা যা তাঁর মনে একটি কাল্পনিক, একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভাবতেন যে জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই তিনি সজীব হয়ে উঠবেন। এমন মানসিক অবস্থায় এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে সেন গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে যেন সাক্ষাৎ পেলেন তাঁর eternal feminine-এর, তাঁর চিরাকাঙ্ক্ষিত 'চিরন্তনী নারী'-র। সেই নারী যেন সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে। ঐ কুহকী রাতে চন্দ্রাহত সেন যখন এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রণয় বেদনা অনুভব করছিলেন, শিহরিত হচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ সেই 'চিরন্তনী নারী'-র অস্বাভাবিক বিকট চিৎকারে, তার সেই মর্মভেদী অট্টহাসিতে সেন বুঝতে পারেন যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত নারীটি আসলে পাগল—একেবারে উন্মাদ; পাগলা গারদ থেকে কোনো সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছিল। রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই হলো সেনের প্রথম ভালোবাসা ও শেষ ভালোবাসা। এই অভিজ্ঞতার তীব্র অভিঘাত সেনের মনকে চিরদিনের জন্য প্রণয় মোহ হতে মুক্ত করেছিল।

দ্বিতীয় কাহিনীটি সীতেশের। তাঁর প্রকৃতি সেনের ঠিক বিপরীত। স্ত্রীজাতির প্রতি মন তাঁর স্বভাবতই নরম। ঐ জাতির দেহ ও মনে যে বিশেষ শক্তি আছে তা তাঁর দেহ-মনকে নিত্য টানতো। সেন যেমন একটি নারীর মধ্যে তাঁর eternal feminine-কে পেতে চেয়েছিলেন, সীতেশ তেমনি তা পেতে চেয়েছিলেন অনেকের ভেতর। ফলে তাঁর মনে ঐ নারীদের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে—কেবল একটি স্ত্রীলোকের স্মৃতি ছাড়া। একদিনের একটি ঘটনা সীতেশ কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। লন্ডনের নিরানন্দময় স্যাঁতস্যাতে বর্ষায় বিরক্ত হয়ে সীতেশ আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন সস্তা উপন্যাস-বর্ণিত অভিজাতবর্গের তরল প্রণয় কাহিনীর মধ্যে। রোমান্টিক উপন্যাসে তা না পেয়ে সীতেশ বেরিয়ে পড়লেন লন্ডনের রাস্তায়। নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ঢুকে পড়লেন একটি পুরনো বই-এর দোকানে। সেখানেই সীতেশ যেন খুঁজে পেলেন তাঁর 'চিরন্তনী নারী'টিকে। গলা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড় পরা স্ত্রীলোকটির পাচুলির গন্ধ আর তার হাসি ও চোখের আলো সীতেশকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। প্রণয়াসক্ত হয়ে

সীতেশ ভেবেছিলেন স্ত্রীলোকটি তাঁর জীবনে 'আলো' হয়ে এসেছে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় 'আলো' নয় 'আলেয়া' হয়ে স্ত্রীলোকটি অন্তর্ধান করে। যাবার আগে চুরি করে নিয়ে যায় সীতেশের পকেটের গিনিকটি, আর কার্ডে লিখে রেখে যায় এক অমোঘ সত্য : "পুরুষ মানুষের ভালোবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক।"

তৃতীয় গল্পের কথক সোমনাথ। তিনি মেধাবী দার্শনিক, রূপযৌবনপূর্ণ পুরুষ কিন্তু প্রণয়বিদ্বেষী। তা সত্ত্বেও সোমনাথ তাঁর জীবনের চিরন্তনী নারীকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। বিলাতের Ilfracombe-এ দেখা পান তাঁর চিরাকাঙ্ক্ষিত নায়িকা রিণী-র। রিণীর মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর eternal feminine-কে। রিণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও প্রেম যেমন আকস্মিক, তার পরিণতিও তেমনি চমকপ্রদ। প্রথম আলাপে তাঁদের মধ্যে যে ভালোবাসার সঞ্চার হলো তাতে হয়তো লঘুচিত্ততার পরিচয় ছিল। কিন্তু এক বছর ধরে সম্পর্কটি এগিয়ে চলায় শেষের দিকে ভালোবাসার গভীরতারও পরিচয় পাওয়া যায়— অন্তত সোমনাথের দিক থেকে। রিণীর কৃতিত্ব এই যে সে নিজে ধরা না দিয়ে দার্শনিক সোমনাথের চির অনাসক্ত মনকে প্রণয় বাসনার পাশে বাঁধতে পেরেছিল। অবশেষে একদিন অভাবনীয় ভাবে এই প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটে। রিণীর পত্র প্রমাণ করল যে সে সোমনাথকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জর্জ-এর প্রণয়াবেগকে তীব্রতর করার জন্য ব্যবহার করেছিল। এটি প্রেম ছিল না, ছিল প্রেমের অভিনয়। রিণীকে জর্জ-এর বিবাহ করবার প্রস্তাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে রিণীর কাছে সোমনাথের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এই প্রতারণার পরে রিণী নিজেও প্রতারিত হলো। বিবাহের বছরখানেক পরেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর স্পেনের একটি কন্‌ভেন্টে চিরজীবনের মতো আশ্রয় হলো রিণীর।

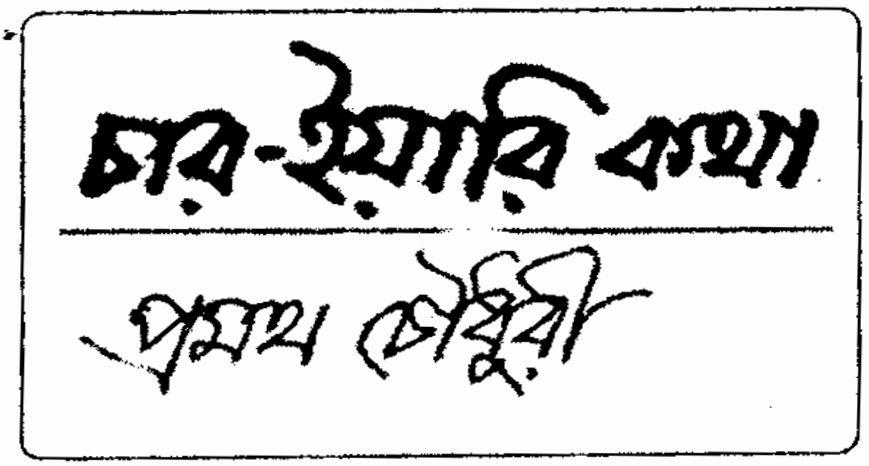

চতুর্থ গল্পটির কথক লেখক নিজে—বন্ধু মহলে যিনি 'রায়' নামে পরিচিত। সেই গল্পের মূল বিষয় হলো 'আনি' নামে এক বিলিতী দাসীর গোপন প্রেমকাহিনী। ভারতীয় প্রেমিক রায়-এর সঙ্গে মিলনের জন্য তার আজীবন সাধনা। রায়-এর বাসা বদলের ফলে ও পরে দেশে ফিরে আসায় আনি-র প্রেম পরিণতি লাভ করে নি। জীবনের পথে ঘা খেতে খেতে সে নার্স-এর জীবিকা বেছে নেয়, যাতে ভবিষ্যতে ভারতে গিয়ে সে রায়কে খুঁজে পেতে পারে। এরপর সে ও তার চিকিৎসক স্বামী দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। তারপরেই আসে আনি-র পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে টেলিফোনে পরলোকবাসিনী 'আনি' তার চিরাকাঙ্ক্ষিত পুরুষটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। লক্ষণীয় যে, এই চতুর্থ গল্পটিতেই কেবলমাত্র একটি অলৌকিক মাত্রা যোগ হয়েছে। রায়-এর কাঙ্ক্ষিত নায়িকা কোনো রক্ত-মাংসের নারী নয়, সে এক প্রেতাত্মা।

চারটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রেম যখন নিবিড় ও আবেশবিহ্বল হয়ে আসছে, তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে আসে গল্পের anti-climax; প্রণয়নেশার রোমান্টিকতাকে উড়িয়ে দিয়ে নায়করা নেমে আসেন বাস্তবের মাটিতে। যে চারটি গল্প বলা হয় তার সবকটিই যেন এই কথাটিই

প্রমাণ করে যে "Love is both a mystery and a joke". এভাবে ভেতরের গল্পে আমরা পাই চারটি উপাখ্যান কিন্তু চারটির ফোকাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'pointing finger', একই। উপাখ্যানগুলির ফোকাস হলো গল্প কথকদের 'চিরন্তনী নারী'কে সন্ধান করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা। পুরো গল্পটির মধ্যে এই ফোকাসটি কখনও সরে যায় নি বলেই এটি একটি সার্থক ছোটগল্প হয়েছে, নইলে এটি হতো চারটি ভিন্ন ভিন্ন গল্প বা আখ্যান। গল্পের শেষে আবার ফিরে আসে কাঠামো গল্পটি। তাতে দেখা যায় রায়-এর গল্প শেষে গির্জের ঘণ্টায় রাত বারোটা বাজলো। চার ইয়ারির অভিভূত অবস্থা কেটে গেল, বাস্তবে ফিরে এলেন তাঁরা, ঘরে ফেরার জন্য চাকরদের গাড়ি জুততে বললেন। অবশেষে তাঁরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

চার-ইয়ারি কথা-র আঙ্গিকের আলোচনায় আরও দু-একটি কথা বলা দরকার। যেমন কাহিনীর কথকরা সকলেই 'আস্থার যোগ্য কথক', কেননা তাঁরা সকলেই তাঁদের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলছেন এবং আমি-র বয়ানে বলা তাঁদের গল্পগুলি তাই শ্রোতার কাছে তথা পাঠকের কাছে সত্য বলে মনে হয়, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তা বলে তাঁদের শ্রোতারা কিন্তু কেউ 'সরল বিশ্বাসী' বা naive নয়। গল্প শুনে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, সংশয় জাগে। সত্য-মিথ্যা তাঁরা যাচাই করতে চান। গল্পের পরিণতিতে খুশি না হয়ে তাঁরা বার বার বাধা দিতে পারেন, গল্পের অসঙ্গতি তুলে ধরে গল্পের পরিণতিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, বিলম্বিত করতে পারেন—ঠিক যেমনটি ঘটে সোমনাথের বেলায়। আর-একটি বিষয় লক্ষ করার আছে, তা হলো গল্পটিতে দুটি 'সময়' বা 'narrative time' আছে। বাইরের কাঠামো-গল্পটি রাখা হয়েছে বর্তমান-এ, মূল কাহিনী চারটি রাখা হয়েছে দূর অতীতে। ফলে গল্পের মধ্যে দুটি সময় কাঠামো দেখা যায়—ফ্রেম গল্প বলার সময় ও মূল কাহিনী বলার সময়। এই দুই সময়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। এই দুই ধরনের সময় ব্যবহার করে লেখক যেন বোঝাতে চান ফ্রেম গল্পটি তিনি 'লিখেছেন' আর মূল গল্পটি তিনি 'শুনেছেন'।

চার-ইয়ারি কথা-র আঙ্গিকটি কোনো ইংরেজি বা ফরাসি ছোটগল্প বা উপন্যাস থেকে ধার করা নয়। বরং এর পেছনে আছে উর্দু বা আরও সঠিক ভাবে ফার্সি সাহিত্যের ঐতিহ্য। ফার্সিতে এক ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়, যাতে বাস্তবের সঙ্গে নানা উদ্ভট ও অলৌকিক ব্যাপার মিশে থাকে। ফার্সিতে এ ধরনের কাহিনীকে বলা হয় *অফসানা*, আজগুবি (অফসানা বলতে বোঝায় মায়াবী বা জাদুকর)। এই অফসানা-র একটি বিশেষ ধারা হলো 'চাহার দরবেশ' নামে এক ধরনের গল্প সংকলন (প্রমথ চৌধুরী 'চাহার দরবেশ' নামেও একটি ছোটগল্প লিখেছেন, সেটিও আমাদের সকলের পড়া উচিত)। এতে একের ভেতর অনেকগুলি অন্য গল্প ঢুকে পড়ে তবে সেগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। গল্পগুলি আলাদা হলেও সেগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ভাবগত মিল থাকে। শেষে ফ্রেম গল্পটি আবার ফিরে আসে; অলৌকিক উপায়ে সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হয়। প্রমথ চৌধুরী *চার-ইয়ারি কথা*-য় 'চাহার দরবেশ'-এর ঐতিহ্যটিকে ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর কৃতিত্ব এই যে তিনি ফ্রেম গল্পের ভেতর যে মূল গল্প তার কাহিনীকে চার-এ বেঁধে রাখেন; ভেতরের গল্পে আর অন্য কোনো কাহিনী আসে না। এই চারটি গল্পের মধ্য একটি ভাবগত যোগও বজায় থাকে। *চার-ইয়ারি কথা*-য় চারটি নায়কই তাঁদের 'চিরন্তনী নারী'-কে খুঁজতে গিয়ে ধোঁকা খেয়েছেন। ফার্সি ঐতিহ্যের সঙ্গে শুধু তফাৎ হলো যে ফার্সিতে ভেতরের গল্পগুলি অলৌকিক কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পে সেগুলি বেশির ভাগই লৌকিক (কেবলমাত্র চতুর্থ গল্পটি খানিক লৌকিক) আর

অলৌকিকভাবে কারুরই ইচ্ছাপূরণ হয় না। ফলে *চার-ইয়ারি কথা*-র রোম্যান্টিক আবহর মধ্যে একটি অ্যান্টি-রোম্যান্টিক মাত্রা যোগ হয়েছে। এটিই হচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিশেষত্ব।

।। ৫ ।।

আমাদের বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যাঁরা বাংলা ছোট-গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন প্রমথ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আর *'চার-ইয়ারি কথা'* প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে একটি। গল্পের গঠনের যে কৌশল, কল্পনার যে চমৎকারিত্ব, অন্তর্দৃষ্টির যে সূক্ষ্মতা এবং প্রকাশের যে অভিনব ভঙ্গী 'চার-ইয়ারি কথা'-য় পাওয়া যায়, শুধু আমাদের নয়, যে কোনো দেশের সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতও তা-ই। তাঁর ধারণা *চার-ইয়ারি কথা* বাংলা সাহিত্যের একটি চিরায়ত সম্পদ। অন্নদাশঙ্করের ভাষায় :

> 'চার ইয়ারী' থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্যে নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্যে নয়, চিত্তের রসের জন্যে নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা 'চার ইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের Swan Song গাওয়া হয়েছে ওতে।

প্রমথ চৌধুরী নিজেও সম্ভবত সচেতন ছিলেন তাঁর এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে। তাই এ ধরনের গল্প দ্বিতীয়বার লেখার চেষ্টা তিনি করেন নি।

রচনাপঞ্জি :

[আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে প্রকাশস্থান কলকাতা বুঝতে হবে।]

অন্নদাশঙ্কর রায়। *দেখা শোনা।* মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রা. লি., ১৩৯৫।

_____। *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজ পত্র।* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।

প্রমথ চৌধুরী। *গল্পসংগ্রহ।* বিশ্বভারতী, ১৯৭৪।

_____। *আত্মকথা।* মনফকিরা, ২০১০।

_____। *রবীন্দ্রনাথ।* মলয়েন্দু দিন্দা সম্পা.। মনফকিরা, ২০১০।

_____। *বিয়োগপঞ্জি।* রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও মলয়েন্দু দিন্দা সম্পা.। সহজপাঠ, ২০১৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *চিঠিপত্র।* পঞ্চম খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৪০০।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। *ন্যারেটলজি : ছোটগল্প : ছোটোদের গল্প।* কোরক, ২০১৪।

সুভাষ চৌধুরী সম্পা.। *ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী।* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০৬।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।* মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৩৬৯।

Mukhopadhyay, Arun Kumar. *Pramatha Chaudhuri*. Sahitya Akademi. 2002 (1st pub. 1970).